আধুনিক ভারতের শিক্ষা

উত্তরাধিকার, উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠা

জ্যোতির্ভূষণ দত্ত

পুনশ্চ

ভূমিকা

'আধুনিক ভারতের শিক্ষা : উত্তরাধিকার, উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠা' এই প্রবন্ধ সংকলনে আধুনিক ভারতের শিক্ষা বলতে গত প্রায় পঞ্চাশ বছরের শিক্ষাকে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা নীতি ঘোষণার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত শিক্ষা-ভাবনা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধরা হয়েছে। আর আধুনিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার উত্তরাধিকারের সময়কাল হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে ১৯৬৮ সালের পূর্বের আনুমানিক দেড়শত বছরকে। এই দেড়শত বছরে ভারতে শিক্ষা সংক্রান্ত যে সব চিন্তা চেতনার উদ্ভব হয়েছে এবং কর্মকাণ্ড ঘটেছে সেগুলিই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ভারতের শিক্ষার পটভূমি এবং উত্তরাধিকার। ভারতের শিক্ষা সম্পর্কিত এই সময়কালের বিভাজন সম্পর্কে বিতর্ক থাকতেই পারে।

১৯৬৮ সালের পূর্বের প্রায় দেড়শত বছর ভারতের সমাজ জীবন এবং শিক্ষা ক্ষেত্র ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। উক্ত সময়ে ঘটেছে বঙ্গীয় নবজাগরণ, ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন তিনটি পর্ব, স্থাপিত হয়েছে কলকাতা মাদ্রাসা, সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুর কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্র। ভারতের অন্যত্রও গড়ে উঠেছে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঐ সময়কালে আবির্ভূত হয়েছেন উনিশ শতকের চিরস্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ এবং জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের অবিসংবাদি পথপ্রদর্শকবৃন্দ। রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, জ্যোতিবা ফুলে, সাবিত্রী বাঈ ফুলে, স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তৃতীয় স্তরে মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছেন মহাত্মা গান্ধি, বাল গঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও জাকির হোসেন সহ অনেক স্বনামধন্য চিন্তানায়ক এবং সংগঠকবৃন্দ।

ভারতবাসীর শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হবার ক্ষেত্রে এবং নানাবিধ কর্মোদ্যোগ সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধান এবং স্বাধীন ভারতের প্রধান তিনটি শিক্ষা কমিশনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং ১৯৬৮ সালের পূর্বে প্রায় দেড়শত বছরে সংগঠিত ঐ সব ঘটনাবলী ও কর্মকাণ্ড এবং সেগুলি থেকে উদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতাকে আধুনিক ভারতের শিক্ষা সম্পর্কিত

উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য করাই সমীচীন। এই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি ও তাদের তাৎপর্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে প্রবন্ধ সংকলনের প্রথমে ১৪টি প্রবন্ধে।

গত প্রায় চার দশক অর্থাৎ ১৯৮০ সাল থেকে ২০২০ সাল তথাকথিত 'নয়াবিশ্বায়ন'-এর নামে এবং বৃহৎ পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের উদ্যোগে পৃথিবীর কাঠামোগত সংস্কারের পথ ধরে বাজার অর্থনীতির মৌলবাদ ভারতসহ পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। পরিমাণগত ও গুণগত অভাবনীয় পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার সংজ্ঞাই পালটে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের মনে জন্ম নিচ্ছে নানা উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠা। এই বিষয়টি ব্যক্ত করার চেষ্টা হয়েছে প্রবন্ধ সংকলনের ১৫নং থেকে ২১নং এর সাতটি প্রবন্ধের মাধ্যমে।

কয়েকটি প্রবন্ধে কিছু তথ্য ও ভাবনার পুনরুক্তি হয়েছে। বিষয়গুলির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে সচেতনভাবে এটা করা হয়েছে। কিন্তু এই পুনরুক্তির কারণে প্রবন্ধগুলি পড়ার সময় পাঠকদের কিছু অসুবিধা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই কথা ভেবে পাঠকবৃন্দের কাছে আগাম মার্জনা চাইছি।

উল্লেখ্য যে, অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করার সব কৃতিত্ব 'পুনশ্চ' প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন শ্রীমান সন্দীপ নায়েক এবং সপ্তর্ষি নায়েকের। ওদের আন্তরিকতা এবং দায়িত্ব গ্রহণের দুঃসাহসিক ইচ্ছা না থাকলে প্রবন্ধ সংকলনটি কলকাতা বইমেলায় প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। কম সময়ের মধ্যে প্রকাশ করার কারণে যদি কিছু ত্রুটি থেকে থাকে তার সব দায় অবশ্যই লেখকের।

প্রবন্ধ সংকলনটি রচনা এবং প্রকাশ করার সর্বস্তরে যাঁর সাহায্য এবং সেই সঙ্গে তাগাদা পেয়ে আমি ধন্য তিনি আমার স্ত্রী ড. নীতা সাহা কুঠিয়াল (মিসেস দত্ত)। ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বিরাগভাজন হব না এবং তাঁকে ছোট করব না।

আমার বিশ্বাস, শিক্ষার সাথে যুক্ত সব ধরনের ব্যক্তি বিশেষ করে শিক্ষা-আন্দোলন এবং শিক্ষা-প্রশাসনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে প্রবন্ধ সংকলনটি কিছুটা সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারবে। এ ছাড়া শিক্ষা-ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরাও প্রবন্ধগুলি থেকে উপকার পেতে পারবেন। যদি আমার এই বিশ্বাস সত্য হয় তাহলেই আমি কৃতার্থ হব।

১৬ জানুয়ারি, ২০২২

জ্যোতির্ভূষণ দত্ত

সূচিপত্র

- বঙ্গীয় নবজাগরণ ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১১
- হিন্দু কলেজ, শিক্ষক ডিরোজিও এবং ছাত্র মধুসূদন ২৬
- নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ৪৭
- পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা বিদ্যাসাগর ৫৫
- মানবিক শিক্ষার অতন্দ্র প্রহরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬২
- রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রসঙ্গ জনশিক্ষা ও শিক্ষার মাধ্যম ৭০
- বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনার রূপরেখা ৭৭
- স্বামী বিবেকানন্দ ঃ আধুনিক বাংলা গদ্যের সার্থক পথিকৃৎ ৮৬
- সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষা ব্যবস্থা—
  পৃথিবীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় উত্তরাধিকার ৯২
- ভারতীয় শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী, সাফল্য ও অসংগতি (১৯৫০-১৯৭৫ সাল) ১০০
- ১৯৭৭ সাল থেকে তিন দশকে পশ্চিমবঙ্গে
  শিক্ষা-সংক্রান্ত ভাবনা ও কর্মকান্ড ১১০
- ভারতীয় সংবিধান ও শিক্ষা ১২৮
- শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ ১৩২

- স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রধান শিক্ষা কমিশনসমূহ ১৩৪
- নয়া বিশ্বায়নে আমাদের শিক্ষা ১৬১
- একবিংশ শতকে ভারতে শিক্ষাসংক্রান্ত ভাবনা ও দুর্ভাবনা ১৬৭
- ভারতে ঔপনিবেশিক শিক্ষার পুনরুত্থান ও মানবিক শিক্ষার অন্তর্ধান ১৭৮
- ভারতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় বনাম বাণিজ্যিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব ১৮৬
- ভারতে শিক্ষা ও ভাষা-আধিপত্যের সংকট ১৯৬
- আমাদের দেশে ইংরেজি পঠন পাঠনের বর্তমান চালচিত্র ২১০
- ভারতীয় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ২১৫

বঙ্গীয় নবজাগরণ ও ভারতের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

মানুষ গড়ার শিক্ষা বলতে বিভিন্ন দেশে যুগে যুগে যে আদর্শ ও কর্মসূচি তুলে ধরা হয়েছে সেটা পরাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুপস্থিত ছিল। ইংরেজ শাসক শিক্ষার মাধ্যমে এদেশে তার অধীনে কাজ করার জন্য এক ধরনের অনুগত ও অল্প যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয় সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। মেকলে সাহেবের সুপারিশক্রমে এবং লর্ড বেন্টিংক-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে (১৮৩৪-৩৫) ইংরেজ ভারতে ইংরেজি ভাষা নির্ভর যে শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করেছিল তার উদ্দেশ্য নিহিত এই বক্তব্যের মধ্যে—"We want a class of persons, Indian in blood and colour but English in taste, in opinion, in moral and intellect." এর ফলশ্রুতিতে ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠল সেটার লক্ষ্য নিম্নবর্গীয় কিছু কর্মচারী প্রস্তুতকরণ। নিম্নমানের এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রকৃতপক্ষে অর্থ রোজগারের প্রয়োজনে এক ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বলাই যুক্তিসঙ্গত। এর উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ অনুগত অর্থ উপার্জনের জন্য বৃত্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ প্রদান। উন্নত কোন সমাজদর্শন বা জীবনাদর্শ ভিত্তি করে এই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আদৌ জাতীয় শিক্ষা হিসেবেও গণ্য করা যায় না। ভারতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা অথবা ভারতীয় জীবনের আদর্শ, ঐতিহ্য এবং ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। সাধারণ ভারতীয়ের জীবনে প্রশিক্ষণধর্মী এই ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক উন্নতির সোপান হিসেবে কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে গ্রামে গঞ্জে প্রচলিত কিছুটা মানবিক আদর্শে গড়ে ওঠা এবং সাধারণ মানুষজনের কাছে গ্রহণযোগ্য দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান ধ্বংসের শিকার হয়েছিল। এর মধ্যেই ভারতীয় এবং কিছু বিদেশিদের প্রচেষ্টায় শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন অঙ্কুরিত হয় প্রায় সমসাময়িক কালে। এই দুই আন্দোলনের প্রধান অনুপ্রেরণা ও প্রেক্ষাপট ছিল উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের জীবনযাত্রা ছিল সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ। অন্ধবিশ্বাস, সামাজিক রক্ষণশীলতা, বর্ণবৈষম্য, কুসংস্কার, পুরোহিত তন্ত্রের প্রভাব, সামাজিক ব্যভিচার, অন্ধ আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি সমাজে স্থবিরতা সৃষ্টি করেছিল। সৃজনশীল জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চার পরিবর্তে প্রাচীন দর্শন ও কুসংস্কার মিশ্রিত ধ্যান ধারণার

চর্বিত চর্বন চলছিল। রক্ষণশীলতার বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের জীবনযাপন। জাতীয় জীবনের এমন দুর্বলতার সুযোগে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ শাসন এবং সেই সঙ্গে সূত্রপাত হয় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব। পাশ্চাত্য শাসনব্যবস্থা ও শিক্ষার প্রভাবে উনবিংশ শতকে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন মূল্যবোধ ও আত্ম সমীক্ষার প্রেরণা লাভ করে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দর্শন চেতনা, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও বিজ্ঞান চেতনা এক সামগ্রিক চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটাল। এই পরিবর্তনই রূপ পেল নতুন করে ভাষা ও সাহিত্য চর্চায়, যুক্তিশীল মানসিকতায়, সমাজ সংস্কার এবং মূল্যবোধের জগতে মৌলিক পরিবর্তনের ইচ্ছা। এই পরিবর্তনকে 'নবজাগরণ' বা 'রেনেসাঁ' (Renaissance) নামে অভিহিত করা হয়। এই রেনেসাঁসের প্রধান অঙ্গ ছিল নিজের দেশের অতীত সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার ও নব মূল্যায়ন।

ইউরোপীয় নবজাগরণের মতো আমাদের দেশে উনিশ শতকের এই নবজাগরণ দেশের চিন্তাজগতে এক প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। ভারতে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রধানতম ক্ষেত্র বাংলাদেশকে অবলম্বন করেই এই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল বলে 'বাংলার নবজাগরণ' হিসেবেই এই আন্দোলন সমধিক খ্যাত। নবজাগরণের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তিবাদ। যুক্তিবাদের প্রভাবেই ধর্মতত্ত্বকে নতুনভাবে অনুসন্ধান করা হল। যেসব কুসংস্কারের আবর্জনায় হিন্দু ধর্মের মর্মবাণী আবৃত ছিল, জঞ্জাল সরিয়ে সেই ধর্মের মৌলিক সত্বা পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টাই ধর্মসংস্কারের রূপ গ্রহণ করেছিল। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস এবং ভবিতব্যবাদ থেকে মানুষের চিন্তাচেতনাকে মুক্তি দিয়ে ব্যক্তিসত্তাকে স্বীকৃতি প্রদানে সচেষ্ট হয়েছে। একেশ্বরবাদ প্রচারের মাধ্যমে বহু বর্ণে এবং উপবর্ণে বিভক্ত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা হয়েছে। যুক্তিবাদের প্রভাবেই মানুষের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সেইসঙ্গে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেও স্বীকার করার আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে। নারীমুক্তির সপক্ষে এবং সতীদাহ, বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে মতাদর্শ গড়ে উঠেছে।

নবজাগরণের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞান চেতনা। প্রশ্নাতীতভাবে কোনো কিছুকে স্বীকার না করে বিজ্ঞান চেতনার কষ্টিপাথরে সব কিছুর মূল্য যাচাই করার মানসিকতার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানের পরীক্ষিত তত্ত্ব যদি অন্য দেশ থেকে ও পাশ্চাত্য ভাষার মাধ্যমে আসে, তবু তা গ্রহণযোগ্য এই দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান এবং উন্নত দার্শনিক তত্ত্ব গ্রহণ করলেই এদেশের প্রাচীন জ্ঞানকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে, এমন দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করা হয়নি। প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক সম্পদের যা মূল্যবান তার সাথে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যা কিছু উত্তম এই উভয়ের সংশ্লেষণ ঘটানোই ছিল নবজাগরণের মর্মবাণী। প্রাচীন সাহিত্যেরও নবমূল্যায়ন হয়েছে, সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ মানুষের নিজস্ব ভাষায় সাহিত্য। পূর্বে সাহিত্যের আঙ্গিক ছিল মূলত দেবপ্রধান কিংবা ভক্তিপ্রধান পদ্য। নবজাগরণে সৃষ্টি হল গদ্য সাহিত্য এবং সেখানে দেবদেবী নয় মানুষই হল সাহিত্যের নায়ক।

মধ্যযুগের সমাজ ছিল গতিহীন স্থাণুর মতো। নবজাগরণে উনিশ শতকে সমাজে গতির সঞ্চার হল। অষ্টাদশ-শতাব্দীতে সামাজিক জীবনে যে নীতিহীনতার প্লাবন এসেছিল, উনিশ শতকে সেখানে এল নতুন নীতিবোধ—বুর্জোয়া নীতিবোধ। এই নীতিবোধ ও ভাবাদর্শের প্রভাবেই অঙ্কুরিত হল আধুনিক জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রথম বীজ।

সমাজ জীবনে নতুনত্বের যে আলোড়ন সৃষ্টি হল, তারই প্রভাবে সৃষ্টি হল পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা। এই মানসিকতার পুরোটাই ইংরেজি শিক্ষা দাবি করাকে ইংরেজের দাসত্ব আলিঙ্গন করা কিংবা তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করা হিসেবে গণ্য করা যায় না। এর মধ্যে আধুনিক চিন্তা গ্রহণ এবং আত্মচেতনা প্রকাশ করার উদ্যোগও ছিল। একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে মধ্যযুগীয় দুর্বলতা দূর করে আধুনিক ভারত তৈরি করবার বাসনাতেই ইংরেজি শিক্ষার দাবি করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে উনবিংশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণ এমন কোনো মৌলিক সামাজিক আলোড়ন কিংবা পরিবর্তন আনতে পারেনি, যা সম্ভব করেছিল ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ এবং বৈষ্ণব আন্দোলন। একথা সত্য যে অল্প সংখ্যক মধ্যবিত্ত উনবিংশ শতকের আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং তাঁরাই এই আন্দোলনের সুফল ভোগ করেছেন। এই আন্দোলন সমাজের শিকড় স্পর্শ করে সমগ্র সমাজ জীবনকে নাড়া দিতে পারেনি। এই আন্দোলন ছিল মূলত শহরভিত্তিক। কিন্তু উনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণ আপামর জনসাধারণের জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি, একথা আংশিক সত্য।

কখনো কখনো মন্তব্য করা হয় যে, ইংরেজদের এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবেই বাংলায় নবজাগরণ হয়েছিল, একথাও সবৈব সত্য নয়। জাতির আভন্তরীণ জীবনে কোনো অন্তর্নিহিত চাঞ্চল্য সৃষ্টি না হলে বাইরে থেকে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা যায় না। বস্তুত মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ দিক থেকেই বাংলার জীবনযাপনে এমন কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটছিল যার প্রভাবে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মত নিজে থেকেই সমাজ বিপ্লব ঘটত, হয়তো ধীর গতিতে। কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতির প্রভাব অনুঘটক হিসেবে পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে একটি আন্দোলনের রূপ দিয়েছিল।

তবে এটা ঠিক যে ব্যাপকতা ও গুণাগুণের দিক থেকে ইউরোপের নবজাগরণের সাথে বঙ্গীয় নবজাগরণের মৌলিক পার্থক্য ছিল। ইউরোপে নবজাগরণ হয়েছিল যে দেশগুলোতে সেগুলি রাজনৈতিক দিক থেকে ছিল স্বাধীন এবং বঙ্গীয় নবজাগরণ যখন ঘটে তখন ভারতবর্ষ ছিল ইংরেজের পরাধীন।

আমাদের কাছে মূল বিবেচ্য বিষয় হল, উনবিংশ শতকের শিক্ষা প্রয়াসের ওপর 'বঙ্গীয় নবজাগরণ'-এর প্রভাব কী ছিল। বঙ্গীয় নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা অবশ্যই উল্লেখ করতে পারি—(ক) ধর্মের যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ, (খ) সাহিত্যে নতুন

ভাবধারা, (গ) মানবতাবাদ ও স্বাধীনতার স্পৃহা (ঘ) অপ্রয়োজনীয় প্রাচীন জ্ঞানের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় আধুনিক জ্ঞানের চর্চা (ঙ) মতাদর্শের স্বাধীনতা ; ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। (চ) পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি এবং ঐ শিক্ষার সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক সুফলের প্রতি আস্থা, (ছ) সমাজ সংস্কারের আগ্রহ, (জ) জাতীয় চেতনার প্রাথমিক উন্মেষ। এই সবগুলি বৈশিষ্ট্যই ভারতের তৎকালীন শিক্ষা প্রয়াসকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত 'নবজাগরণ'-এর প্রভাবে তিনটি শিক্ষা বিষয়ক মানসিকতার ধারা এবং ঐ ধারার সাথে যুক্ত তিনটি গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল। প্রথম গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের কর্ম প্রচেষ্টায় উগ্রতা ছিল না। তাঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহনই ছিলেন ভবিষ্যৎ আধুনিক ভারতের পথপ্রদর্শক। তাঁকে বলা হয় 'ভারতপথিক'। অবশ্য রামমোহন একাই এই পথের পথিক ছিলেন না। তাঁর সহযোগী ছিলেন টাকির কালিনাথ রায়, মন্মথনাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতি। তাঁর বিরুদ্ধ গোষ্ঠীও কম শক্তিশালী ছিলেন না। রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে এই দলে ছিলেন মতিলাল শীল, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি। এঁরা মূলত লড়াই করছিলেন একটা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্বের স্বার্থে। এই রক্ষণশীল দলের নেতারা একদিকে যেমন প্রাচীন সনাতন হিন্দু ঐতিহ্য সংরক্ষণের চেষ্টায় প্রবলভাবে সচেষ্ট ছিলেন এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করতেও আগ্রহী ছিলেন। এই ধারার শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই বঙ্গীয় নবজাগরণে আরও একটি গোষ্ঠী ছিল যাঁরা সামাজিক সংস্কার ও পরিবর্তন চেয়েছেন আপোষহীনভাবে। নতুনত্বের আশায় এই দল চরমপন্থা অবলম্বন করেছেন। এই দলের পথপ্রদর্শক ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। এই খ্রিস্টান তরুণ ছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের (Young Bengal movement) দীক্ষাগুরু, নবযুগের এক পরম বিস্ময়। হিন্দুকলেজের এই তরুণ অধ্যাপক ১৮২৬ সাল থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত সময়ে ছাত্রদের মনে যে সাহস ও স্বাধীন অনুসন্ধিৎসার ভাব জুগিয়েছিলেন তাতে স্তম্ভিত হয়েছিল তৎকালীন বাঙালি সমাজ। ইয়ং বেঙ্গলের সভ্যদের ক্ষুরধার যুক্তি সচেষ্ট হয়েছিল তৎকালীন ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার আবরণ ছিন্নভিন্ন করতে। ডিরোজিও Academic Association গড়ে তোলেন। এখানে তিনি ছাত্রদের স্বাধীনভাবে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতেন। ওখানে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস, মূর্তিপূজা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, মানবতাবাদ, দেশপ্রেম এবং শিক্ষা (নারী শিক্ষাসহ) বিভিন্ন বিষয়ে আলোচিত হত। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিও তাঁর শিষ্যদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন দেশাত্মবোধের মন্ত্রে। যাবতীয় ধর্মীয়

গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, প্রাণহীন চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে অনুপ্রাণিত করতেন তিনি ছাত্রদের। এই ইয়ং বেঙ্গল দলে ছিলেন কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, রসিকমোহন মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ি, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক ও অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি।

বঙ্গীয় নবজাগরণের আন্দোলন ছিল সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপী। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ডিরোজিও, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, রাধাকান্ত দেব, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকের মাধ্যমে বঙ্গীয় নবজাগরণ মূর্ত হয়ে উঠেছিল। শতাব্দীর প্রথমভাগে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। আর শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলার নবজাগরণে প্রাচীন পন্থী, নবীনপন্থী ও উভয়ের সমন্বয়—এই তিন ধারার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এই তিন ধারা শিক্ষা ক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রভাব সঞ্চারিত করেছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও নবজাগরণের সাড়া জেগেছিল। কোথাও বাংলার সমসাময়িক কালে, কোথাও পরবর্তীকালে, অসমভাবে এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন ভারতের দুজন নেতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বোম্বাইয়ের জগন্নাথ শংকর শেঠ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষার জন্য ভারতীয় বেসরকারি উদ্যোগের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যকরণ সমর্থন করেননি এবং ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম করতে চাননি। বোম্বাইয়ের মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে এবং তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাঈ ফুলে বালিকা বিদ্যালয় ও হরিজনদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। গণশিক্ষার জন্য দাবি উত্থাপন শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রেষ্ঠ অবদান।

বে-সরকারি ইউরোপীয়রাও ওই সময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বে-সরকারি ভারতীয় ও অভারতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় এবং যৌথ প্রয়াসই বেশি লক্ষ করা যায়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এই বে-সরকারি উদ্যোগ সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত এবং পদাধিকারগত আনুকূল্য ও সাহায্য পায়। বেম্বাইতে ১৮১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বম্বে এডুকেশন সোসাইটি প্রচলিত অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং নতুন বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সোসাইটি থেকে উদ্ভুত 'বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি' ১৮২২ সাল থেকে ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা, পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন এবং শিক্ষা-শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগী হয়। মাদ্রাজেও অনুরূপভাবে মাদ্রাজ স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৮ সালে কাশীতে জয়নারায়ণ ঘোষালের অর্থ আনুকূল্যে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং গঙ্গাধর শাস্ত্রীর দানে আগ্রাতে আগ্রা কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে বাংলার ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নবজাগরণের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার কথা মেনে নিলেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে নবজাগরণের প্রভাবেই আমাদের দেশে, বিশেষ করে বাঙালির জীবনে আধুনিকতার